INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH
(IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট মোচনে যোগ

*রাজকুমার মোদক
**অনিতা ব্যানার্জি

সারাংশ

'সংকট' শব্দটাকে যতটা নেতিবাচক বলে মনে করা হয় , একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, শব্দটা ততটা নেতিবাচক তো নয়ই; বরং মানব সভ্যতার অগ্রগতি লুকিয়ে রয়েছে ঐ সংকট মোচনের মধ্যেই । তবে এই সংকট মোচন একদিক থেকে যেমন নতুন পথের সুলুক সন্ধান দিয়ে করা যায়, তেমনই প্রচলিত যে ধ্যান-ধারণা রয়েছে তার নবরূপায়ণের মাধ্যমেও সম্ভব । এই রকমই একটা সংকট হল পদার্থ বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কারের ফলে উঠে আসা পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট । তবে এটিকে সরাসরি পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট না বলে পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনের (Philosophy of Physics) সংকট বলাই ভাল । যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপরোক্ত নামধারী প্রবন্ধ লিখতে বসা সেগুলি হলঃ পর্ব—১) পদার্থ বিজ্ঞানের এই সংকটকে অকপট ভাবে তুলে ধরা । পর্ব—২) এই সংকট মোচনের জন্য যে প্রচলিত তত্ত্ব রয়েছে তা ব্যাখ্যা করে সেই সকল তত্ত্বগুলির সীমাবদ্ধতা প্রদর্শন এবং পর্ব—৩) পরিশেষে যোগ-দর্শনের মাধ্যমে এই সংকট নিরসনের প্রয়াস ।

সূচক শব্দঃ পদার্থ বিজ্ঞান, সংকট, যোগ, মোচন, দর্শন, নবরূপায়ণ

* *Professor*, ***Assistant Professor of Philosophy, SKBU*

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH
(IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

পর্ব—১) পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট

কিভাবে ও কোন পরিস্থিতিতে পদার্থ বিজ্ঞানে সংকট নেমে এল এবং কেমনভাবে তা পদার্থ বিজ্ঞান সংক্রান্ত দর্শনেও (Philosophy of Physics) প্রভাব বিস্তার করল, সেই দিকে প্রথমেই দৃষ্টিনিক্ষেপ না করে আমরা যদি শুরুটা, মানুষ কি করে মানুষ হল, সেখান থেকেই করি, তাহলে ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও রমাকৃষ্ণ মৈত্রের লিখিত 'পৃথিবীর ইতিহাস'(১৩৬৩) নামক গ্রন্থ অনুসরণে দেখব যে, মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার মূলে রয়েছে (ক) মানুষের দুটি হাতের মুক্ত ব্যবহার আর (খ) ভাষার ব্যবহার । সোজা পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ানো মানেইতো হাত দুটিকে স্বাধীন ভাবে ব্যবহার করা । এতে আর কি এমন রহস্য লুকিয়ে রয়েছে ? এমন মনে করাটা স্বাভাবিক হলেও, যেটা না বললেই নয়, সেটা হল সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়েই মানুষের কয়েক লক্ষ বছর পার হয়ে গেছে । সোজা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে, লাভের জায়গাটা হল চোয়াল দুটিকে আর দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার কাজে লাগাতে হয় না । মানুষের চোয়াল যখনই দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার হাত থেকে ছাড়পত্র পেল তখনই চোয়ালের আকার গেল ছোট হয়ে । পূর্বে মাথায় মস্তিস্কের আকার ছোট থাকার অন্যতম কারণ ছিল মাথায় চোয়ালের জন্য অনেকখানি জায়গার বরাদ্দ হয়ে যাওয়া । চোয়ালের আকার ছোট হওয়ার ফলে মানুষের মাথায় চোয়ালের জন্য বরাদ্দ জায়গা যত কমতে শুরু করলো ততবেশী মস্তিষ্কের আকার যেমন বাড়ল তেমনই মস্তিষ্কের উন্নতিও হতে থাকল । 'পৃথিবীর ইতিহাস' এর ভাষায় , "বন মানুষের থাবার বদলে যতই কিনা মানুষের হাত হয়েছে ততই বদলেছে মাথার ভিতরের মস্তিষ্কটিও । আকারে তা বড় হয়েছে , গড়নে তা ভালো হয়েছে , আর তারই দরুণ মানুষের বুদ্ধি এতখানি , এমন বেশী ।' আর এটা ঘটেছে সেনোজাইক যুগে অর্থাৎ ১,৫০০,০০০ থেকে ১,০০০,০০ বছরের মধ্যে ।

এই মতের সমর্থন আমরা পাই ২০১৪ সালে প্রকাশিত য়ুভ্যাল নোয়া হারারির লেখা " A Brief History of Human Kind" নামক বইয়ে । বলাইবাহুল্য এই যে , হারারির সিদ্ধান্তের মূলে ছিল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং তার থেকে লব্ধ তথ্য । তিনি এই বইয়ে দেখান যে মানুষ অর্থাৎ হোমো-স্যাপিয়েন্স ছাড়াও অন্যান্য স্যাপিয়েন্স যেমন হোমো-নিয়েনডারথ্যালেনসিস , হোমো-

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

সোলেনসিস , হোমো-ফ্লোরেনসিস , হোমো-ডেনিসোভা , হোমো-রুডলফেনিস এবং হোমো-ইরাগাস্টার এরা কালক্রমে অবলুপ্ত হয়ে গিয়েও হোমো-স্যাপিয়েন্সরাই কেন টিকে থাকল । হারারিও মনে করেন, এর মুলে রয়েছে মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ । তবে তিনি মস্তিষ্কের বিকাশের চাবিকাটিটি উদ্ধার করেছেন মানুষের শিকারে অপটুতা থেকে । ব্যাপারটা খানিকটা অবাক বলে মনে হলেও বিষয়টা ছিল কতকটা এইরকমঃ অপরাপর প্রাণী-প্রজাতির থেকে দূর্বল মানুষ যখন খাবারের সন্ধানে যেত তখন তার কাছে যেটা পরে থাকত সেটা হল বাঘ , সিংহ , শৃগাল বা হায়নাদের রেখে যাওয়া খাবারের উচ্ছিষ্ট—হাড়-গোড় । এই হাড়-গোড় তো আর খাওয়া যায় না । যা খেয়ে বেঁচে থাকা যায় সেটা হল ঐ হাড়-গোড় এর মধ্যস্থ মজ্জা । কিন্তু সেখানেও বাধা । মজ্জা কিভাবে নিষ্কাশিত হবে ? কারণ মানুষের দাঁত এতটা সবল নয় যা দিয়ে সে হাড়-গোড় ভেঙে মজ্জাটাকে নিষ্কাশন করে খেতে পারে । তাই সে উপযুক্ত হাতিয়ারের অন্বেষণ করতে লাগল । এমন হাতিয়ার যা দিয়ে ঐ হাড়-গোড়গুলিকে অতি সহজে ভাঙা যায় । হাতিয়ার যত উন্নত হবে কায়িক পরিশ্রমও তত কম । আর এখান থেকেই শুরু হল মানুষের মস্তিষ্কের বিকাশ তথা প্রজাতি রূপে মানুষের জয় যাত্রা এবং কালক্রমে অভিব্যক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমস্ত প্রাণী-প্রজাতির শীর্ষে জায়গা করে নেওয়া । লক্ষণীয় যে অ্যারিস্টটলও প্রায় তিনশ বছর আগে মানুষকে এমন বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব বলেছেন যে কিনা ভবিষ্যৎ এর জন্য পরিকল্পনা করতে পারে । ছান্দোগ্য উপনিষদেও বলা হয়েছে মানুষের সারাৎসার হল ভাষার ব্যবহার । ‘*পুরুষস্যবাকরসঃ।*’

মানুষের মানুষ হয়ে ওঠার উপরোক্ত ব্যাপারস্যাপারের কথা মাথায় রেখে যদি আমরা যুগপৎ দর্শন ও বিজ্ঞান এর দিকে তাকাই তাহলে লক্ষ করব যে একজন ব্যক্তিকে আমরা তখনই দার্শনিক বলে আখ্যায়িত করতে পারি যখন তিনি মানুষকে কিভাবে সঠিক চিন্তা করতে হবে অন্ততঃপক্ষে তার একটা দিশা দেখান । অপরপক্ষে, একজন বিজ্ঞানী বিশেষত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীর কাজই হল বস্তুজগৎ এর গঠন বিন্যাসের মূলে যে নিয়ম বা রীতি রয়েছে সেটিকে খুঁজে বের করা । কেউ বলতেই পারেন, চিন্তা তো আমরা অনায়াসেই করতে পারি । এটা আমাদের

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH
(IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

সহজাত ক্ষমতা । তাহলে আর দার্শনিকদের কাছ থেকে আলাদাভাবে শেখার কি আছে ? এটা ঠিক যে চিন্তন করার ক্ষমতাই মানুষকে অপরাপর প্রাণীর থেকে আলাদা তো করেইছে পাশাপাশি সে ভবিষ্যৎ এর জন্য পরিকল্পনাও করতে পারে । কিন্তু, চিন্তনও পরিশীলিত হওয়া দরকার । না হলে যে কোন মুহূর্তেই চিন্তন আত্মঘাতি হয়ে উঠতে পারে । আর এইখানেই দার্শনিকদের চিন্তনের দিশা দেখানোর ক্ষেত্রে একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থেকেই যায় ।

কিন্তু যে প্রশ্নটাকে কেন্দ্র করে গোটা দার্শনিক কুলতো বটেই , পাশাপাশি বিজ্ঞানীরাও পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে সেটা হল জগৎ এর মূল স্বরুপের উন্মোচন । এ প্রসঙ্গে, বস্তুবাদ ও ভাববাদ, এই দুটি মূল দার্শনিক মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলেও জড়বাদ নামে আর একটি প্রচলিত মতবাদ রয়েছে যেখানে বলা হয় যে সমগ্র জগৎ এর মূলে রয়েছে জড় পরমাণু । সমগ্র জগৎ এমনকি মনও জড়েরই কোন না কোন রুপান্তর । জগৎ সৃষ্টির মূলে না আছে কোন উদ্দেশ্য , না আছে কোন কারণ । জগতের গতি প্রকৃতি কতকটা লক্ষ্মীছাড়া , সৃষ্টিছাড়া , না আছে কোন লক্ষ্য , না আছে কোন উদ্দেশ্য এই রকমই আর কি ! কথাটা শুনে একটু উদ্ভট বলে মনে হলেও প্রাচীন গ্রীক পরমাণুবাদীরা এবং ভারতীয় দর্শনে চার্বাকরা এইরকমই অভিমত সুদীর্ঘ কাল লালন-পালন করে এসেছেন । একথা অবশ্য ঠিক যে ‘প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ’ এই মতে বিশ্বাসী চার্বাকরা সূক্ষ্ম পরমাণুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । এখন যদি জগতের মূলে জড় পরমাণু ছাড়া অন্য কিছু নেই যদি এই কথাই বলা হয় তাহলে আবার একটি অসুবিধা থেকেই যায় । আর সেটা হল জড় মাত্রেই বিভাজ্য । আর বিভাজ্যতাই যদি জড়ের স্বগতঃ ধর্ম হয় তাহলে পরমাণু কেমনভাবে জগৎ গঠনের মূলে থাকবে? কারণ যেটা মূল তাকে তো নিয়ত, শাশ্বত, সনাতন হতেই হবে । এই কারণে পাশ্চাত্য দার্শনিক লাইবনিজ পরবর্তীকালে জগৎ গঠনের মূলে পরমাণু রয়েছে বলে মনে করলেও সে গুলিকে আর জড় বলেন নি । বলেছেন চেতন । আর নাম দিয়েছেন মনাদ বা চিৎ-পরমাণু ।

এখন জড়ের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে চেতনার দিকে ঢলে পরাটা যে কেবলমাত্র দর্শনের মধ্যে সীমাবদ্ধ তা নয় । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও এর যথেষ্ট প্রভাব লক্ষণীয় । প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিশেষতঃ পদার্থ

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও সুদীর্ঘ কাল ধরে এই বিশ্বাস ছিল যে জগৎ গঠনের মূলে রয়েছে অবিভাজ্য পরমাণু । এই পর্যন্ত সব ঠিক ঠাক ছিল । কিন্তু সমস্যা বাঁধল যখন পদার্থ বিজ্ঞানে ক্ল্যাসিকাল ধ্যান-ধারণার বাইরে গিয়ে বল বাদি কণা তত্ত্বের (Quantum Physics) অনুপ্রবেশ ঘটল । আর এখান থেকেই পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট এর উদ্ভব ।

যাইহোক, এই ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করার পূর্বে অপর দুটি দার্শনিকমতের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে এই দুটির একটি হল বস্তুবাদী আর অপরটি ভাববাদী । বস্তুবাদীরা মনে করেন, বাহ্যবস্তুর মন নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রয়েছে । বাহ্যবস্তুকে আমরা জানি কতকগুলি ধারণা বা সংবেদনের মাধ্যমে । অপরপক্ষে, ভাববাদীরা মনে করেন, এমন কোন বিশুদ্ধ উপায় নেই যার মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত করে বলতে পারি যে আমার কাছে প্রোথিত সংবেদন আর বাহ্য জগৎ হুবহু এক । তাই জগৎ আমারই ভাবনার ফসল । স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও বলেছিলেন,

‘আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ
চুনি উঠল রাঙা হয়ে
আমি চোখ মেললুম আকাশে
জ্বলে উঠল আলো
পুবে পশ্চিমে ।’

এই ভাববাদকে কিছুটা হলেও প্রশ্রয় দিয়েছেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট । তিনি বলেন , আমরা ‘দেশ’ ও ‘কাল’ এর সীমারেখাকে অতিক্রম করে স্বয়ং-সৎ জগৎকে(noumenan world) জানতে পারিনা । আমরা যে জগতের জ্ঞান পাই তা হল অবভাসিক জগতের (phenomenal world) জ্ঞান । যদিও তিনি ‘দেশ’ ও ‘কাল’ এদেরকে অভিজ্ঞতার দিক থেকে বাস্তব (empirically real) এবং অতীন্দ্রিয় দিক থেকে অবাস্তব (transcendentally ideal) বলায় বৈজ্ঞানিকদের জগৎকে বাস্তব ধরে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জায়গাটা যেমন খোলা রেখেছিলেন তেমনই দার্শনিক দিক থেকে জগতের জ্ঞান কেমন হবে তার দিকটিও খোলা রেখেছেন । কিন্তু হেগেল কান্টের মত জগৎকে স্বরূপতঃ অজ্ঞেয় না বলে সরাসরি বললেন এই জগৎ আমাদেরই ভাবনারই ফসল । অর্থাৎ তিনি জগৎ আছে অথচ তাকে জানতে পারিনা বা যে জগৎকে জানি সেই জগৎকে অবভাসিক না বলে বললেন জগৎ আমারই সৃষ্ট । অর্থাৎ হেগেল আর ধানাইপানাই না করে সরাসরি চূড়ান্ত

ভাববাদের আশ্রয় নিলেন । প্রশ্ন হলঃ জগৎকে আমরা কেমন ভাবে সৃষ্টি করি ? এটা দেখাতে গিয়ে তিনি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (Dialectic method) অবলম্বন করেন । জগৎকে আমরা আবিষ্কার করি বাদ (thesis), প্রতিবাদ (antithesis) এবং সম্বাদ (synthesis) এই তিনটি দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির এককের সাহায্যে । ব্যাপারটা কতকটা এইরকমঃ ধরাযাক আমি আমার চেতনায় বইকে পেলাম এটা হল বাদ (thesis), কিন্তু বই আমার সমস্ত প্রয়োজন সিদ্ধ করতে পারে না, তাই হয়ে উঠল প্রতিবাদ (antithesis), আবার প্রয়োজনের তাগিদে নতুন করে পেনের ধারণা করলাম হয়ে উঠল সম্বাদ (synthesis) । সুতরাং, জগৎ এই ভাবেই আমার দ্বারাই সৃষ্ট ।

কিন্তু, বিজ্ঞানীরা একদিক থেকে যেমন জড়বাদকে প্রশ্রয় দিতে পারেন না, তেমনই ভাববাদীদেরকেও মেনে নিতে পারেন না । জড়বাদ স্বীকার করলে কোনো কিছুকে যেমন ন্যাচারাল বলা যায় না , তেমনই কার্যকারণ সম্পর্ককেও হেলায় হারাতে হয় । জড়বাদ আসলে যদৃচ্ছাবাদকেই মান্যতা দেয় । পাশাপাশি জগৎ কে যদি ভাবের ঘরের ফসল বলা হয় তাহলেও বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন অর্থ হয়না । কারণ, সেই বিষয় গুলিই বৈজ্ঞানিকদের কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতাধীন বলে বিবেচিত হবে যেগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং পরিমাপযোগ্য । তাই বৈজ্ঞানিকরা বস্তুবাদকেই মেনে চলার পক্ষপাতী ।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা যদি বিভিন্ন রকমের দার্শনিক তত্ত্ব গুলোর (Philosophical thoughts) দিকে তাকাই তাহলে খেয়াল করে দেখব যে দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদই (Dialectic Materialism) বস্তুজগতের অস্তিত্বকে শর্তহীন ভাবেই মেনে নিয়েছে । যদিও দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদে (Dialectic Materialism) দ্বন্দ্ব (Dialectic) এবং বস্তুবাদ (Materialism) এই দুটি পদ থাকলেও দ্বন্দ্বই (Dialectic) হল মূল । তবে দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) কখনই হেগেলের মত ভাবজগতের ব্যাপার নয় । এটা ইহ জগতেরই বিষয় এবং সমাজের মূল চালিকা শক্তি । মার্কস ও এঙ্গেলসের Manifesto of the Communist Party র দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমাজের মূল চালিকা শক্তিকে

এইভাবে বলা যায়—বিজ্ঞানের নব নব আবিস্কার উৎপাদনের হাতিয়ার গুলির (forces of production) মধ্যে আনে পরিবর্তন, যা কালের নিরীখে অবশ্যম্ভাবী । কিন্তু উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production) সেটা কোনভাবেই মানতে চায় না । কেননা, তাহলে উৎপাদন থেকে লব্ধ যে মুনাফা তার উপর কর্তৃত্ব থাকে না । ফলস্বরূপ উৎপাদনের হাতিয়ার (forces of production) ও উৎপাদন সম্পর্ক (relations of production) এদের মধ্যে দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী । এর হাত থেকে কিভাবে নিরসন সম্ভব ? আর এটাই এগিয়ে চলার লক্ষণ । এটাই গতি বা এটাই পরিবর্তন । দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদে (Dialectic Materialism) মনে করা হয় প্রলেতারিয়েতরা বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় এলে এই দ্বন্দ্ব পুরোপুরি নিরসন সম্ভব । কারণ তখন উৎপাদন সম্পর্কের (relations of production) মধ্যে যে লাগাতার দ্বন্দ্ব সেটা আর থাকবে না । যেহেতু তখন একাধিক পুঁজিপতির অবসান হয়েছে । যাইহোক দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এর মাধ্যমে আদৌ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব কি সম্ভব নয় সেটা এখানকার আলোচ্য বিষয় নয় । যেটা মূল আলোচ্য বিষয় সেটা হল দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদে (Dialectic Materialism) মননিরপেক্ষ বাহ্যজগতের অস্তিত্বের স্বীকার । এই ব্যাপারটিই দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদকে (Dialectic Materialism) পদার্থ বিজ্ঞানের কাছাকাছি এনে দিয়েছে ।

কিন্তু সমস্যা বাঁধল যখন পদার্থ বিজ্ঞানে একে একে বেশ কয়েকটি আবিষ্কার হল । যেমন ১৮৯৫ সালে এক্সরের আবিষ্কার, ১৮৯৬ সালে রেডিয়ো অ্যাক্টিভিটি বা তেজস্ক্রিয়তার আবিষ্কার এবং ১৮৯৭ সালে ইলেকট্রনের আবিষ্কার । প্রশ্ন হল, এক্ষেত্রে সমস্যা কি হল? বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার তো স্বাভাবিক ঘটনা । একটু আগে বলা হয়েছে যে দার্শনিকরা সঠিক চিন্তার পথ দেখান । চিন্তাও এলো মেলো হবার জো টি নেই । সেখানেও বেশ কিছু নিয়ম বলবত রয়েছে । এই নিয়মগুলি হল মুলতঃ তিনটি । তাদাত্ম নিয়ম(Law of Identity) যেখানে বলা হয় ‘ক হয় ক’, বিরোধ-বাধক নিয়ম (Law of non-contradiction) যেখানে বলা হয় ‘ক এবং অ-ক’ সব সময়েই মিথ্যা , নির্মধ্যম নিয়ম (Law of excluded middle) যেখানে বলা হয় ‘ক অথবা অ-ক’

সব সময়েই সত্য । বলাবাহুল্য এই যে, দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) কিংবা দ্বন্দ্বমুলক ভাববাদ (Dilectical Idealism) যাইহোক না কেন চিন্তার এই নিয়ম গুলিকে মেনে চলতে বাধ্য ।

পদার্থ বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারগুলি কেন সমস্যার উদ্রেক করল সেটা বলার আগে উল্লেখ করা উচিত যে দর্শন ও বিজ্ঞান উভয়েই জগতের মূলস্বরুপ উন্মোচনের প্রচেষ্টা চালালেও তাদের পদ্ধতি ও দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা আলাদা । আর এই উদ্দেশ্যে ব্রতী হয়ে কখনও তারা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে আবার তারা কখনও পরস্পরের দূরে চলে গেছে । সোজাকোথায়, এরা একে অপরের পরিপূরক । সাধারণভাবে পাশ্চাত্য দর্শনে প্লেটোর সময় থেকে যে মেটাফিজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়া হয় তার সুদূর প্রসারী প্রভাব লক্ষ করা যায় । আর এই প্রভাব যে বিজ্ঞানে পরেনি তা নয় । মেটাফিজিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গীর মূল কথা হল সনাতন বা অ-পরিবর্তনীয়তা— ধ্রুব বা শাশ্বত সত্যের সন্ধান বা সংক্ষেপে সনাতন প্রবণতা । পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিউটনের গতিসুত্রগুলিকে ও পরমাণুর অবিভাজ্যতাকে সামনে রেখে ভৌতিক জগতের সমস্ত কিছুকেই ব্যাখ্যা করা সম্ভব একটা সময় পর্যন্ত মনে করা হত । আর এটাই পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সনাতন প্রবণতা । তবে দর্শন ও পদার্থ বিজ্ঞানের এই সনাতনপন্থী চিন্তাধারার মধ্যেও যে পার্থক্যটা উল্লেখ না করলেই নয় সেটা হল পদার্থ বিজ্ঞানে আর যাইহোক ভাববাদের কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না । যদিও পূর্বে উল্লেখ করাই হয়েছে যে , দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদও (Dialectic Materialism) ভাববাদের ঘোরতর বিরোধী । যাইহোক, আসল কথা হল মন অতিরিক্ত জগতের বাস্তবতা স্বীকার না করলে পদার্থ বিজ্ঞান অসম্ভব ।

কিন্ত, পূর্বে উল্লিখিত আবিষ্কারগুলি যখন পরমাণুকে হটিয়ে দিয়ে গতিবাদকেই প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তখন তা আসলে পরমাণু তথা বাস্তব জগৎকেই হটাতে চাইছে । আগে উল্লেখ করা হয়েছে যে গ্রীক পরমাণুবাদের দুর্বলতা ছিল এই জায়গায়, যে জড় পরমাণু মাত্রই বিভাজ্য হওয়ায় তারা জগতের মূল কারণ হতে পারেনি । তাই লাইনবিজ এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ঐ পরমাণুগুলিকে চেতন বলেছেন । কিন্তু এখন কীভাবে রক্ষা পাওয়া

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

যাবে? এই আবিষ্কারগুলি আসলে পদার্থ বিজ্ঞানকেই সংকটে ফেলে দিয়েছে । যেহেতু আবিষ্কারগুলি প্রত্যক্ষকের পরিসীমাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে সেহেতু অনেকে মনে করেন এগুলি পদার্থ ধ্বংসেরই নামান্তর ।

পর্ব—২) পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট মোচনের প্রচেষ্টা ও তার সীমাবদ্ধতা

অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানী মাখ ও তাঁর অনুগামীরা এই সংকটের হাত থেকে পদার্থ বিজ্ঞানকে উদ্ধার করার জন্য প্রত্যক্ষ বিচারবাদের (Emperio Criticism) প্রচার করেন । যেখানে তারা দাবী করলেন এই যুগান্তকারী আবিস্কারগুলি আসলে বস্তুবিলোপেরই ইঙ্গিত বহ । প্রত্যক্ষ বিচারবাদ (Emperio Criticism) ছাড়া এখান থেকে বেড়িয়ে আসার কোন পথ নেই । প্রত্যক্ষ বিচারবাদ (Emperio Criticism) এর মূল কথা হল 'বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষই হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মূলভিত্তি ।' অতএব বৈজ্ঞানিকদেরও দর্শন হবে এর বাইরে গিয়ে কোন কিছুর অস্তিত্বে বিশ্বাস না রাখা । সোজাসাপটা কথায় সংবেদনের বাইরে গিয়ে কোন কিছুকে স্বীকার না করা । পদার্থ বিজ্ঞানে যখন পরমাণুর নিত্যতাকে অতিক্রম করে কণার গতির উপর আস্থা রাখা হচ্ছে সেটা আসলে পদার্থ বিজ্ঞান সন্মত ভাববাদ (Physicalistic Idealism) ছাড়া আর কিছুই নয় । কান্টের প্রখ্যাত অনুগামী হারমান কোহেন তাই বলেন, পরমাণুর অস্তিত্ব কে ছাপিয়ে বলবাদী কণাতত্ত্বে পা ফেলা মানেই বস্তুবাদের পরাজয় এবং ভাববাদের জয় ।

যাইহোক প্রত্যক্ষ বিচারবাদ (Emperio Criticism) এর দ্বারা স্বয়ং আইনস্টাইনও যেমন প্রথম দিকে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তেমনি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলবাদী কণাতত্ত্বের (Quantum Physics) অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক । আইনস্টাইন তো এতটাই প্রভাবিত হয়েছিলেন যে বলেই ফেললেন, 'এমনকি যারা নিজেদের মাখ বিরোধী বলে মনে করেন তাঁদের হুঁশ থাকেনা যে মাতৃদুগ্ধ পানের মতই তাঁরা নিজেরা মাখের থেকে কতটা পুষ্টি সংগ্রহ করেছেন ।'তবে তাঁর এই মোহভঙ্গ হয় ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক যখন বলবাদী কণাতত্ত্বের (Quantum Physics) প্রতিষ্ঠার দাবিতে পদার্থ বিজ্ঞান সন্মত ভাববাদকে (Physicalistic Idealism) একেবারে কুটি কুটি করে খণ্ডন করতে চাইছেন । তিনি খুব জোর দিয়ে বলেন , সংবেদনের বাইরে গিয়ে

বাহ্য জগৎ স্বীকার না করলে পদার্থ বিজ্ঞান অসম্ভব । তবে সেইসময় এই পদার্থ বিজ্ঞান সন্মত ভাববাদকে (Physicalistic Idealism) এর প্রভাব কতটা ছিল বোঝা যায় মৌল কণা বিজ্ঞানের অন্যতম স্রস্টা জাপানী বিজ্ঞানী সাকাতার কথা বার্তায় । তিনি বলেন , ১৯২৮ সালে পাউলি যখন দেখান , বীটা অবক্ষয়ের সময় ইলেকট্রনের সঙ্গে তড়িৎ শূন্য মৌল কণা পরমাণুর মধ্যে থেকে বেড়িয়ে আসছে এবং এই কণাটাই হারিয়ে যাওয়া শক্তির বাহক । তিনি এই কণাটির নাম দিলেন 'নিউট্রিনো ' । কিন্তু 'নিউট্রিনো 'র আবিষ্কার সংক্রান্ত প্রবন্ধটি সেই সময় কোন পত্রিকাতেই স্থান পায়নি । এটি স্থান পায় যখন ইউকাওয়া 'মেসন' এর অস্তিত্বকে অবিসংবাদী রূপে প্রমাণ করেন ।

কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের এই সংকট থেকে বেড়িয়ে আসার উপায়টা কি? আর যাইহোক প্রত্যক্ষ বিচারবাদ (Emperio Criticism) উপায়টা বাতলাতে পারছে না? এই উপায় অন্বেষণে যেমন বিজ্ঞানীরা রত তেমনই এগিয়ে এলেন দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) সমর্থনকারী দার্শনিকরা । কেননা আগেই বলা হয়েছে তাঁরা শর্তহীন ভাবে বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করেন । এদের মধ্যে অবশ্য লেনিন ছিলেন অগ্রগণ্য । তিনি এই সমস্যা সমাধানের একটি খুব সুন্দর পথ বাতলিয়ে দিলেন । বললেন, পদার্থ বিজ্ঞানের যে সঙ্কটের কথা বলা হচ্ছে আর যার কারণে পদার্থ বিজ্ঞান সন্মত ভাববাদকে (Physicalistic Idealism) একদিক থেকে যেমন প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে ও প্রত্যক্ষ বিচারবাদ (Emperio Criticism) রাজ করছে সেটি আসলে কোন সংকট নয় । মানে যে সংকট এর কথা বলা হচ্ছে তা আর যাইহোক পদার্থ বিজ্ঞানের নয়, সংকটটা হল পদার্থ বিজ্ঞানের তত্ত্ববিচারের সংকট । তিনি বলেন , 'বস্তুবিলোপ' হয়েছে তার মানে এই নয় যে বস্তুর অস্তিত্বকে সংবেদনের হাতে তুলে দেওয়া । বরং এটা বলা যায় , ইতিপূর্বে আমরা যে সীমারেখার মধ্যে বস্তুকে জেনেছি সেই সীমারেখার বিলুপ্তি হয়েছে । বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানের গভীরতা অনেক বেড়েছে । এতদিন পর্যন্ত যে গুণগুলিকে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বস্তুর স্থায়ী ধর্ম বলে মনে করা হয়েছিল সেগুলি আসলে আপেক্ষিক এবং বস্তুর ঐ আপেক্ষিক ধর্মেরই পরিচায়ক । তবে দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এর সঙ্গে পদার্থ বিজ্ঞানের

মতের মিল একটা জায়গায় যে উভয়েই সংবেদনের অতিরিক্ত বাহ্য জগতের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছে । মানব প্রকৃতি অনেক আশ্চর্যজনক আবিষ্কার করেছে আর করতেই থাকবে , আর তার ফলে প্রকৃতির উপর মানুষের কর্তৃত্ব দিনের পর দিন বাড়তেই থাকবে ; কিন্তু তার মানে এই নয় যে প্রকৃতিটাই মানুষের মনগড়া । মানুষ যখন ছিলনা তখন যেমন প্রকৃতির অস্তিত্ব ছিল , মানুষ প্রকৃতির উপর যতই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন , প্রকৃতির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকবেই ।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে লেনিনের এই বক্তব্যে কোন কোন পদার্থ বিজ্ঞানী মাখের বক্তব্যের বিরুদ্ধে গিয়ে বিজ্ঞান সাধনার পুষ্টি খুঁজে পেয়েছেন । যেমন জাপানী বিজ্ঞানী সাকাতা । আসলে প্রকৃতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন নানা স্তর বর্তমান ; প্রতিটি স্তরে তার প্রাসঙ্গিক নিয়মের পরিচয় থাকলেও , এই স্তরগুলি পরস্পর বিছিন্ন বা স্বাধীন নয় । এগুলি পরস্পরের সঙ্গে যে শুধুমাত্র সম্পর্কিত তাই নয় , পরস্পরের উপর নির্ভরশীল । উৎপত্তি , বিনাশ ও পারস্পরিক প্রভাবের প্রক্রিয়ায় লিপ্ত এক সামগ্রিক সত্তা হিসাবেই প্রকৃতির অস্তিত্ব ও অভিজ্ঞতা । দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এর এই বক্তব্যই সাকাতাকে অনুপ্রাণিত করে ।

দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) অনুসারে জগৎকে পরিবর্তনশীল রূপে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে । প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লাইটাস এবং বৌদ্ধ দার্শনিকদেরও বক্তব্য তাই । পরিবর্তনশীলতাই জগতের মূল । অর্থাৎ জগতে কোনকিছুই স্থির নয়, নিশ্চল নয়, অবিচল নয় । সবকিছুই অনিত্য বা নিয়ত পরিবর্তনশীল, জন্ম মৃত্যুর নিয়মাধীন । তাহলে প্রশ্ন ওঠে জগৎ মানেই যদি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনশীল হয় তাহলে আমাদের এই সনাতন প্রবণতা কেন? আসলে এই সনাতন প্রবণতার কারণ হলঃ সাবয়ব জগতের প্রতিটি অবয়বের খুঁটিনাটি অথচ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান ছাড়া পরিবর্তনশীল জাগতিক ঘটনার সামগ্রিক চিত্র পাওয়া সম্ভব নয় । আর এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বৈজ্ঞানিকরা তাদের অনুসন্ধানে ব্রতী । তারই ফলস্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের বিপুল সমাহার গড়ে উঠেছে। কিন্তু যে পদ্ধতি অবলম্বন করে জাগতিক ঘটনার সামগ্রিতাকে বোঝার জন্য খণ্ড খণ্ড জ্ঞানরাশির বিপুল

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

সমাহার গড়ে তোলা হয়েছে সেই পদ্ধতি মেটাফিজিক্যাল বা সনাতন পদ্ধতি । আর এর ফলে জাগতিক সামগ্রিতায় যে পরিবর্তনশীলতা রয়েছে সেটিকে কালক্রমে উপেক্ষা করে সাবয়ব জগতের জ্ঞানকেই শাশ্বত বা সনাতন বলে মনে করা হয়েছে । এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনশীলতাকে হটিয়ে সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীকে সামনে এনে দিয়েছে ।

মেটাফিজিক্যাল মানেই হল—সনাতন বা অপরিবর্তনীয়তা—ধ্রুব বা শাশ্বত সত্যের সন্ধান, বা সংক্ষেপে সনাতন প্রবণতা । কিন্তু প্রশ্ন হল এই মেটাফিজিক্যাল বা সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর অসুবিধাটা কোথায়? অন্য কথায়, জগৎকে অপরিবর্তনশীল ধরে নিয়ে এগুলে অসুবিধাটা কোথায়? এক্ষেত্রে সমস্যা হল লজিকের চিরায়ত নিয়মগুলিকে অস্বীকার করা । লজিকের এই চিরায়ত নিয়মগুলি অর্থাৎ তাদাত্ম নিয়ম (Law of Identity), বিরোধ বাধক নিয়ম (Law of non-contradiction), এবং নির্মধ্যম নিয়ম (Law of excluded middle) আবার সঠিক চিন্তনের নিয়মও বটে । এই নিয়মগুলি ছাড়া কোন জ্ঞানেরই স্পষ্টীকরণ সম্ভব নয় । সনাতন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করলে বলতে হবে যা সৎ তা শুধু সৎ, নিছক সৎ; তার সঙ্গে অসতের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না । একইভাবে যা অসৎ তা শুধু অসৎ, নিছক অসৎ; তার সঙ্গে সৎ এর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না । এখন দুটি পরস্পর বিরোধী ধারণা যদি একে অপরের ঐকান্তিক বিরোধী হয় তাহলে ঐ ধারণা দুটি একে অপরের অভাব সূচক হবে । ফলস্বরুপ দুটি বিরোধী ধারণা বা দুটি বিরুদ্ধ বিষয়ের মধ্যে কোনদিনই সমন্বয় সম্ভব হবে না। তাহলে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির সাহায্যে (যা পূর্বে বলা হয়েছে) জগৎ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান হতে পারেনা এমনটাই সিদ্ধান্ত করতে হবে ।

একথা না হয় স্বীকার করা গেল যে দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) সংবেদনের অতিরিক্ত জগৎকে স্বীকার করায় আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান এর গবেষণার পথকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে । তবে একথা ভুললে চলবেনা যে দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) কখনই বস্তুবাদ থেকে দ্বান্দ্বিকতার দিকে ধাবিত হয় না । বরং দ্বন্দ্বমুলক ভাববাদ থেকে দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদের দিকে আসতে চেয়েছে । তবে এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বই যে মূল এটা কখনই অস্বীকার করা যায় না

। কারণ দ্বন্দ্ব লজিকের মুল নিয়মের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত।

কিন্তু সমস্যা আরও গাঢ়তর হল পদার্থ বিজ্ঞান এর বেশ কিছু অত্যাধুনিক আবিস্কার যখন লজিকের নিয়মগুলিকেও নতুনভাবে চ্যালেঞ্জ জানাতে শুরু করে দিল । উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় , বলবাদী কণাতত্ত্ব (Quantum Physics) অনুযায়ী যখন একটি ইলেকট্রন যদি এক অ্যাটোসেকেন্ড (১×১০-১৮ ভাগের এক ভাগ) সময়ের মধ্যে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের চারিদিক ঘুরে চলে আসতে পারে তখন 'একই বস্তুরপক্ষে একই জায়গায় থাকা এবং না থাকা অসম্ভব' এই নিয়ম থাকা বা না থাকার কোন মানে হয় না । কারণ এটা আমাদের অনুভবে ধরা পরে না । যদি ধরেও নেওয়া হয় যে আমাদের সংবেদনে ইলেকট্রনের গতি ধরা না পরলেও অন্ততঃপক্ষে যৌক্তিক দিক থেকে বলাই যায় যে একই বস্তুরপক্ষে একই জায়গায় থাকা এবং না থাকাটা অসম্ভব ।

এই সমস্যাটিকে এইভাবে বাইপাস করা গেলেও পদার্থ বিজ্ঞান এর অন্য আবিস্কারগুলি যখন আবারও সেই লজিকের নিয়মগুলিকে চ্যালেঞ্জ এর মুখে এমন ঠেলে দেয় যে সেখান থেকে বেড়িয়ে আসাটা বেশ কষ্ট কর । ত্বরণ যন্ত্রের সাহায্যে যখন একটি প্রোটন কণাকে ২৮০ মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্টের থেকে বেশী গতিতে ছুটিয়ে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত অপর একটি প্রোটন কণাকে আঘাত করার ফলে 'পাইজিরো' ভর বিশিষ্ট যে মেসন কণার উৎপত্তি হয় তা কিন্তু শেষমেশ দ্বান্দ্বিকতার পরিপন্থী হয় । কেননা এটা সর্বজন বিদিত যে প্রোটন কণা পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী । মেসন এর উৎপত্তি মানে দুটি পজিটিভ তড়িৎ ধর্মী বিষয়ের মধ্যেও সংঘাত সম্ভব । সোজাকথায়, বিরোধ বা সংঘাত হতে গেলে লজিকের নিয়মানুযায়ী যে ক এবং অ-ক এদেরকেই চাই তা নয় , দুটি সত্যের মধ্যেও সংঘাত হতে পারে এবং তা থেকে নতুন কোন সত্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই । যদিও দুটি প্রোটন কণার মধ্যে সংঘাত তখনই ফলপ্রসূ হবে যদি গতি অতি উচ্চ হয় । সুতরাং এখান থেকে স্পষ্ট যে পদার্থ বিজ্ঞান এর এই সকল আবিস্কার দ্বান্দ্বিকতার নিয়মটিকেই টাল-মাটাল করে দিয়েছে । ফলস্বরূপ দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) এর যে প্রাণ ভোমরা—দ্বন্দ্ব সেটাই আর না থাকায় , দ্বন্দ্বমুলক বস্তুবাদ (Dialectic Materialism) নিজেই আর দাঁড়াচ্ছে না ।

তাছাড়া সনাতন পন্থী হওয়া মানেই যে ধনতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক হতেই হবে এমন ভাবাটাও সঠিক নয় ।

পর্ব—৩) সংকটের নিরসনে যোগ

সুতরাং, এখন যে সংকটের সন্মুখীন আমরা হচ্ছি সেটাকে সরাসরি পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট না বলে পদার্থ বিজ্ঞানে উদ্ভুত পরিস্থিতির দ্বারা সৃষ্ট দার্শনিক সংকট বলাই ভাল । তবে এক্ষেত্রে পদার্থ বিজ্ঞান পরোক্ষ ভাবে যুক্ত এই কারণে যে, যে বিজ্ঞানই হোক না কেন তার যে আবিষ্কার সেটাকে কখনই চিন্তার নিয়ম বিরোধী হলে চলবে না । যদি হয়ও সেক্ষেত্রে হয় চিন্তার নিয়মগুলিকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা দিতে হবে নতুবা অন্য দার্শনিক চিন্তন খুঁজতে হবে যেখান থেকে উদ্ভুত সংকটের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেতে পারে । এখানে যে সংকট সেটা হল দুটি সত্য পাশাপাশি রাখলেও তৃতীয় সত্যে উপনীত হওয়া সম্ভব কি না ? ঠিক যেমন দুটি প্রোটন কণার সংঘাতে নতুন মেসন কণার উৎপত্তি হয় । সোজাকথায়, পদার্থ বিজ্ঞানের এই নবতম আবিস্কারের সঙ্গে দার্শনিক ভাবনার মেল বন্ধন কিভাবে ঘটানো যাবে? উত্তরে বলা যায় যে হ্যাঁ একটি পথ খোলা আছে । আর সেটা হল যোগ ।

এই উত্তর শুনে মনে হতেই পারে যে যোগ হল পুরোপুরি আধ্যাত্মিক ব্যাপারের সঙ্গে সম্পৃক্ত আর পদার্থ বিজ্ঞান সম্পর্কিত বাস্তব ব্যাপারের সঙ্গে । আধ্যাত্মিক মানে ঠিক কি বোঝায় অর্থাৎ বাস্তবতার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার ঠিক কতটা যোগ সেই দিকটা এখানে বিবেচনাধীন নয় । যোগের আর একটা দিক রয়েছে সেটা হল এর মাধ্যমে একদিক থেকে যেমন মুক্তির কথা বলা হয়েছে তেমনই যোগ মানে সমন্বয় সাধন বা যুক্ত হওয়া । ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যুক্ত হওয়া । ভক্ত ও ভগবান এদের মধ্যে কোন বিরোধ নেই । প্রবল আকুতিই এই মেল বন্ধনে সাহায্য করে ভক্তকে এনে দেয় মুক্তি । সুতরাং এখানেও দুজনার মধ্যে সংঘাত থেকে নতুনের উদ্ভব , তবে এই দুজন পরস্পরের বিরোধী না হওয়ায় একে স্বরূপ সংঘাত বলা যেতে পারে । ঠিক যেমন উচ্চগতি সম্পন্ন দুটি প্রোটন কণার সংঘাতে নতুন মেসনের উৎপত্তি তেমনই প্রবল আকুতির দ্বারা ভক্ত ও ভগবান এর সমন্বয়েই মুক্তি সম্ভব ।

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

যাইহোক এই যোগের কথা আমরা বেদ , উপনিষদ , ভাগবতগীতা , বশিষ্টের যোগ-বশিষ্টে, প্রদীপিকার হঠযোগ এ পেলেও যোগ এর একেবারে সুসংবদ্ধরূপ আমরা পাই পতঞ্জলির 'যোগসুত্রে' । পতঞ্জলি যোগের মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের মুক্তি । নানা রকমের দুঃখের হাত থেকে চিরতরে নিবৃত্তি । যদিও পতঞ্জলি পুরুষ ও প্রকৃতির ভেদজ্ঞানের অভাবকেই অর্থাৎ অবিদ্যাকেই দুঃখের মূল কারণরুপে চিহ্নিত করেছেন তা হলেও তিনি মনে করেন চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি বা পরিণাম বা অবস্থাগুলির মাধ্যমেই দুঃখের উপলব্ধি হয় । আর চিত্তের এই পরিণাম বা বৃত্তিগুলি হলঃ প্রমাণ , বিপর্যয় , বিকল্প , নিদ্রা ও স্মৃতি । এই চিত্তবৃত্তির হাত থেকে নিস্তার পাওয়া মানেই হল দুঃখের উপলব্ধির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া । তাই পতঞ্জলি যোগ বলতে বোঝেন চিত্তবৃত্তির নিরোধকে । অর্থাৎ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" তবে এর জন্য যেটা দরকার সেটা হল অষ্টাঙ্গ মার্গ—যম , নিয়ম , আসন , প্রাণায়াম , প্রত্যাহার , ধারণা , ধ্যান ও সমাধির পালন । পতঞ্জলির মতে চিত্তবৃত্তি যেমন পাঁচপ্রকার তেমনই চিত্তভুমিও পাঁচপ্রকার । এগুলি হলঃ খিপ্ত , বিখিপ্ত , মূঢ় , একাগ্র ও নিরুদ্ধ । অষ্টাঙ্গযোগ মার্গের মাধ্যমে সমাধিস্ত অবস্থায় চিত্ত নিরুদ্ধ হয় । আর এটাই যোগের লক্ষ্য ।

এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটা হল এই যে অষ্টাঙ্গযোগ মার্গের যে স্তরগুলি রয়েছে অর্থাৎ যম , নিয়ম , আসন , প্রাণায়াম , প্রত্যাহার , ধারণা , ধ্যান ও সমাধি এদের মধ্যে যেমন কোন বিরোধ নেই তেমনই চিত্তের পরিণাম বা বৃত্তিগুলির অর্থাৎ প্রমাণ , বিপর্যয় , বিকল্প , নিদ্রা ও স্মৃতি এদের মধ্যেও কোন বিরোধ নেই । শুধুমাত্র তাই নয় , চিত্তভূমিগুলি—খিপ্ত , বিক্ষিপ্ত, মূঢ়, একাগ্র ও নিরুদ্ধ এদের মধ্যেও কোন বিরোধ নেই । এগুলি প্রকৃতপক্ষে একটির তুলনায় অপরটি সু-উচ্চ । দুটি স্তর পাশাপাশি অবস্থান করলেও তৃতীয় স্তরে যেতে কোন বাধা নেই ।

একইভাবে যেখানে যোগ বলতে যুক্ত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে সেখানে আমরা যদি তাকাই বিষয়টা আরও স্পষ্ট করে ধরা পরে । এখানে যুক্ত হওয়া বলতে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হওয়া । ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের মাধ্যমে ব্যক্তিমানুষ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্তিলাভ করতে পারেন । ভাগবতগীতাতে যোগ বলতে বিশেষ কর্ম দক্ষতাকে বোঝান হয়েছে যার

INDIAN JOURNAL OF PHILOSOPHICAL RESEARCH (IJPR)

A Peer Reviewed, Biannual, Bilingual (English & Bengali) Online Journal
Volume-I, Issue-1, Jan-Jun 2025

মাধ্যমে ব্যক্তি-মানুষ স্থিত-প্রাজ্ঞরূপে বিবেচিতহন । তাই গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫০ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে,

বুদ্ধিযুক্তো জহৎতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে ।
তন্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্মসুকৌশলম।।

অর্থাৎ যিনি ভগবত ভক্তির অনুশীলন করেন তিনি এই জীবনেই পাপ-পুণ্য উভয় থেকে মুক্ত হন । সুতরাং হে অর্জুন, তুমি নিস্কাম কর্মযোগের অনুশীলন কর সেটাই হল সর্বাঙ্গীণ কর্মকৌশল ।

ভক্তিযোগ , কর্মযোগ , জ্ঞানযোগ ও রাজযোগের মধ্যে একদিক থেকে যেমন কোন বিরোধ নেই অপরদিক থেকে ভক্তিযোগকেই অনেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেন । পঞ্চদশ শতকে শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু হুসেন শাহের রাজত্ব কালে যখন একদিক থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রবল অত্যাচার অপরদিক থেকে ইসলাম ধর্মের প্রচণ্ড পরাক্রমে সাধারণ হিন্দু সমাজ জর্জরিত তখন ভক্তিযোগের মাধ্যমে সারা দেশে এমন প্রেমের জোয়ার আনেন যে দ্রাবির খাস, সাকার মল্লিক, যবন হরিদাস এরা গোস্বামীর ভূমিকা পালন করেন । শুধুমাত্র তাই নয়, ভগবান শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিযোগকে এমনভাবে প্রচার করেন যে সমাজের মধ্যে যে সকল অবৈজ্ঞানিক সামাজিক স্তরবিন্যাস ছিল তা তিনি দূর করতে সমর্থ হন । আর তাঁর নব্য চিন্তাধারায় গোস্বামীরাই সমাজের সব থেকে উচ্চস্তরে আসীন হয় । যে কেউই তার কর্মগুণের মাধ্যমে গোস্বামী হতে পারেন । জন্মগত বলেই গোস্বামী হবেন এই রকমটি নয় ।

শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসও শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর মত ভক্তিযোগকেই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করলেও তাঁর প্রচারিত যে বাণী 'যতমত তত পথ' সমন্বয়ের শিক্ষাই দেয় । এও এক প্রকারের যোগ । উদ্দেশ্য একটাই । আর সেটা হল মুক্তি ।

পরিশেষে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রবন্ধের অবতারণা সেটা মাথায় রেখে বলা যায় যে যোগকে শুধুমাত্র শারীরিক রোগ থেকে মুক্তি বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ এমনটি না ভেবে এর যে আরও বৃহত্তর প্রেক্ষাপট রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করলে চলবে না । আর সেটা পদার্থ বিজ্ঞানের সংকট মোচন হোক বা এই রকমই অন্য কিছু হোক ।